শুকনো শিকড় পচা ও চারা ধসা ঃ এই রোগটি ছত্রাক নামক জীবানু দ্বারা সংক্রামিত হয়। জীবানুটি মাটিতে থাকে এবং বীজ পচা, চারাধসা এবং শুকনো শিকড় পচা রোগ সৃষ্টি করে। ছোট ছোট গোলাকার বাদামি দাগ কচি কচি পাতায় দেখা যায়। ঘন বাদামি দাগ গাছের ডাঁটায় বা শাখায় দেখা যায়। পরে ঐ শাখাগুলি বা পুরো গাছটিই মারা যায়। এই জীবানুটি বীজ কিংবা মাটি উভয় জায়গাতেই বেঁচে থাকে।

প্রতিকার ঃ ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ৪ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। এছাড়াও কার্বেন্ডাজিম (৫০% ড্রু পি) ২ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়। তার পরেও এই রোগ দেখা গেলে কার্বেন্ডাজিম (৫০% ড্রু পি) গ্রাম প্রতি লিটার জলে ১৫ দিন অন্তর দুবার স্প্রে করলে এই জীবানুকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব।

পাতায় সাদা গুড়ো রোগ ঃ রোগটি একটি ছত্রাকের কারনে হয় ও ফলনের প্রচুর ক্ষতি করে। ফুল আসার সময় থেকে ফলে শুটি ধরার সময় এই রোগের সমস্যা বশি দেখা যায়। সাদা পাউডারের মত ছত্রাকের স্পোর পাতার উপর দেখা যায়। যার ফলে পাতায় আলোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে ও পাতা ঝরে পড়ে। শুটি ধরতে পারে না ও ফলনের প্রচুর ক্ষতি করে।

প্রতিকার ঃ এই রোগ দেখা মাত্র কার্বেন্ডাজিম (৫০% ড্রু পি) ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে বা কার্বেন্ডাজিম (২৫%) + ম্যানকোজেব (৫০%) ২.০ গ্রাম প্রতি লিটার জলে ১০-১৫ দিন অন্তর পাতায় দুবার স্প্রে করে এই রোগটি ভালভাবে প্রতিকার করা যায়।

পাতা ফুটো করা পোকা ঃ অনেক সময় দেখা যায় বীজ বোনার ১৫-৩০ দিনের মাথায় পাতা ফুটো করতে দেখা যায়, পাতা খেয়ে ফেলে, ফলন কমে যায়।

প্রতিকার ঃ এই রকম আক্রমন ঘটতে দেখা গেলে প্রতিকার হিসাবে ইমিডাক্লোপ্রিড (১৭.৮ এস এল) ০.৫ মিলি প্রতি লি জলে বা কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড (৫০% এস পি) ১.০ গ্রাম প্রতি লি জলে স্প্রে করলে সহজেই প্রতিকার করা যায়।

পাতা খেকো শুঁয়ো পোকা ঃ এই পোকার আক্রমণ এক সাথে অনেক সময় বেশি দেখা যায় ও দলবদ্ধ ভাবে থাকে এবং খুব তাড়াতাড়ি পাতা পাতা খেয়ে ফেলে শুধু মাত্র ডাঁটাগুলো বা গাছটি থাকে। ল্যাদা জাতীয় পোকায় বেশি করে আক্রমণ হয়। এটি বিহার হেয়ারী ক্যাটার পিলার নামে পরিচিত।

প্রতিকার ঃ এই পোকার আক্রমণ ঘটতে দেখা গেলে প্রতিকার হিসাবে কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড (৫০% এস পি) ১.০ গ্রাম প্রতি লি জলে বা ক্লোরোপাইরিফস (২০% ইসি) ২.৫ মিলি প্রতি লি জলে স্প্রে করলে সহজেই প্রতিকার করা যায়।

ফলন ঃ ৯০-১০০ দিনে একসাথে শুটি কালো হয়ে গেলে গাছ কেটে নিতে হবে। একর প্রতি ফলন প্রায় ৩৫০-৪৫০ কে জি।

তথ্য ও সংকলন - ডঃ ধনঞ্জয় মন্ডল, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ, উদ্ভিদ সুরক্ষা

প্রকাশক - ডঃ বিকাশ রায় , বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান

বিশদ জানার জন্য যোগাযোগ করুন -

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ভাকৃঅনুপ
ICAR

চোপড়া - ৭৩৩২১৬, উত্তর দিনাজপুর, পঃ বঃ

মোবাইল - ৭৫৮৪০৭৭২১০, ই-মেইল ঃ udpkvk@gmail.com

উন্নত প্রথায় কালো কলাই (মাস কলাই) এর চাষ

মানুষের চাহিদা অনুযায়ী একই জমিতে একই ধরনের ফসল চাষ বা বারবার চাষ করার ফলে কৃষিকার্যের ধরন পাল্টেছে, ফসলে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগের ঝোঁক বেড়েছে, দুই ফসলের মধ্যে তোলা ও লাগানোর সময় কমে এসেছে, সেই সঙ্গে পাল্টেছে ফসলের রোগ - পোকার চরিত্র। এলাকায় ডাল জাতীয় শস্যের চাষ কম দেখা যায়। চাষিদের নিকট এই ভয় লক্ষ্য করা যায় যে ডাল জাতীয় শস্যের শুটিতে দানা হয় না বা ফলন খুব কম তাই এই জাতীয় ফসল চাষে খুব আগ্রহ দেখা যায় না। মাটিতে অম্লতার মাত্রা বেশি হওয়ায় ও গ্রহণযোগ্য ফসফেট, পটাশিয়ামের পরিমান কম থাকায় সেই সঙ্গে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও কয়েকটি অনু খাদ্য যেমন দস্তা, বোরন ও মলিবডেনাম কম থাকায় ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা আশানুরুপ নয়। তবে বোরোনের অভাব খুব প্রকট ভাবে লক্ষ্য করা যায়, যার প্রভাব ডাল চাষে বেশি দেখা যায়। ডালশস্য গভীর শিকড়যুক্ত শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ হওয়ায় এদের শিকড়ে রাইবোজিয়াম জীবানু গুটি তৈরি করে থাকে, যা বাতাসের নাইট্রোজেন সরাসরি আবদ্ধ করে গাছকে সরবরাহ করে। ফলে ডালশস্য ও ডালশস্যের পরবর্তী ফসলে নাইট্রোজেন কম লাগে। কোনো জমিতে প্রথমবার ডালশস্য চাষ করলে ফলন ভাল হয় না। কেননা ওই জমিতে ফসলের প্রয়োজনীয় রাইজোবিয়াম জীবানু থাকে না, সেক্ষেত্রে বীজ বোনার আগে ডালশস্যের বীজের সঙ্গে রাইজোবিয়াম কালচার মিশিয়ে নিতে হবে পুরানো ডালশস্য চাষ হওয়া জমির মাটি নতুন জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। কালচার মেশানোর এক সপ্তাহ আগে বীজশোধন করা দরকার, অন্যথায় বীজশোধনের ওষুধে রাইজোবিয়াম জীবানু মারা যাবে। ডালশস্যে ভাল ফলন পাওয়ার জন্য ডি এ পি গুলে স্প্রে করা দরকার। ডালশস্যে ভাল ফলন পেতে অম্লজমিতে অবশ্যই চুন জাতীয় উর্বরক ব্যবহার করতে হবে। জমিতে বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে জৈব সারের বেশি করে প্রয়োগ করতে হবে ও সুষম হারে মূলসার ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় জমিতে সালফারের ঘাটতি দেখা যায়, সেই জন্য মূলসার সিঙ্গল সুপার ফসফেট (এস এস পি) ব্যবহার করলে সালফারের যোগান বৃদ্ধি পায়। অম্লজমিতে বা অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত জমিতে বিশেষত এই উত্তরবঙ্গের মাটিতে বোরোনের অভাব খুব বেশি দেখা যায়। মাটিতে মুল সার হিসাবে সোহাগা বা বোরাক্স প্রয়োগ করলে বা পাতায় স্প্রে করে বোরোনের অভাব মেটালে অধিক ফলন পাওয়া যায়। ডালশস্য চাষে আমাদের অনীহা খুব বেশি দেখা যায়। অথচ ডালশস্য থেকে সবচেয়ে বেশি উদ্ভিজ প্রোটিন পাওয়া যায়।

জমি ও মাটি নির্বাচন ঃ দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ যুক্ত মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি ও যেখানে বৃষ্টির জল জমে না বা অন্য কোনো ভাবে জমিতে জল আসার বা জমে থাকার সম্ভবনা থাকে না এবং মাটি খুব কম পরিমানে রস ধরে রাখে সেই জমি সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।

জমি তৈরী ঃ জমিতে জো থাকলে দুই ধাপে আড়াআড়ি ভাবে ২-৩ বার লাঙ্গল দিয়ে জমি চষার পর মই দিতে হবে ও পুরানো আগাছা গুলিকে নষ্ট করে দিতে হবে। তবে মাটি খুব ঝুরঝুরে করার দরকার নেই, অল্প ঢেলা থাকলে আগাছার পরিমান কমে। তবে যারা জমি চাষ না করে কলাই লাগানো হয় তাহলে জমির আগাছা আগে নষ্ট করে দিতে হবে বা মেরে ফেলতে হবে। সেই জন্য গ্লাইফসেট (৪১% এস এল) গোত্রের ওষুধ ৫ মিলি লি জলে গুলে আগাছার উপর স্প্রে করতে হবে। আগাছা মরার জন্য কম করে ৭-১০ দিন অপেক্ষা করতে হবে।

উন্নত জাত ঃ উত্তরা (আই পি ইউ ৯৪-১), সুলতা (ড্রু বি ইউ - ১০৯), পন্থ ইউ - ৩১, আজাদ - উরদ - ১ (কে ইউ - ৯২-১), সারদা (ড্রু বি ইউ - ১০৮), গৌতম (ড্রু বি ইউ - ১০৫), কে ইউ ৯১, আই পি ইউ ০২-৪২, মাষ - ১১৪, এন ইউ এল - ৭, বসন্ত বাহার (পি ডি ইউ - ১)।

বীজ বোনার সময় ঃ বর্ষাকালে বা খারিফে চাষ করলে ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা যায়। তবে উত্তরা, সারদা, পন্থ ইউ - ৩১, গৌতম, মাষ - ১১৪, এন ইউ এল - ৭ জাত গুলি খারিফে বা বর্ষাকালে চাষ করা ভালো। গ্রীষ্ম কালে বা বসন্তে চাষ করলে ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে। সুলতা (ড্রু বি ইউ - ১০৯), পন্থ ইউ - ৩১, আজাদ - উরদ-১ ১ বসন্ত বহার (কে ইউ -৯২ -১) গ্রীষ্ম কালে বা বসন্তে চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

বীজের হার ঃ বর্ষাকালে সারিতে বুনলে একর প্রতি ৪.৫-৫.৫ কেজি ও ছিটিয়ে বুনলে একর প্রতি ৫-৬.৫ কেজি বীজের প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা গেছে এর থেকে বেশি পরিমানে বীজ বপন করা হলে গাছ ঘন হয় ও গাছের বাড় বেশি হওয়াতে শুটির সংখ্যা বা ফলন কম হয়। প্রতি বর্গমিটারে ২২-২৫ টি গাছ রাখা উচিত। তবে গ্রীষ্ম কালে বা বসন্তে চাষ করলে বীজের পরিমান একটু বেশি দিতে হবে, কেননা এই সময় গাছের বৃদ্ধি কম হয়।

বীজ শোধন ঃ বীজ বপন করার এক সপ্তাহ আগে বীজ শোধন করা দরকার, অন্যথায় বীজশোধনের ওষুধে রাইজোবিয়াম জীবানু মারা যাবে। ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ৪ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। এছাড়াও কার্বেন্ডাজিম (৫০% ড্রু পি) ২ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়।

বীজ বোনার পদ্ধতি ঃ চাষীভাইরা সাধারণতঃ ছিটিয়ে বীজ বোনেন তবে ছিটিয়ে বোনার থেকে সারিতে বীজ বুনলে গাছ পাতলা করতে, নিড়ানী দিতে ও অন্যান্য অন্তবর্তী পরিচর্যা করতে অনেক সুবিধা হয় ও মজুরি কম লাগে। সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি হবে।

সার প্রয়োগ ঃ জমিতে বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে জৈব সারের বেশি করে প্রয়োগ করতে হবে ও সুষম হারে মূলসার এনঃ পিঃ কেঃ হেক্টর প্রতি ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় জমিতে সালফারের ঘাটতি দেখা যায়, সেই জন্য মূলসার সিঙ্গল সুপার ফসফেট (এস এস পি) ব্যবহার করলে সালফারের যোগান বৃদ্ধি পায়।

জীবানুসার ব্যবহার ঃ কোনো জমিতে প্রথমবার ডালশস্য চাষ করলে ফলন ভাল হয় না। কেননা ওই জমিতে ফসলের প্রয়োজনীয় রাইজোবিয়াম জীবনু থাকেনা, সে ক্ষেত্রে বীজ বোনার আগে ডালশস্যের বীজের সঙ্গে রাইজোবিয়াম কালচার মিশিয়ে নিতে হবে বা পুরানো ডালশস্য চাষ হওয়া জমির মাটি নতুন জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাজারে প্রতিটি ডাল শস্যের জন্য আলাদা আলাদা করে রাইজোবিয়াম কালচার পাওয়া যায়। বীজ বোনার আগে ৬০০ গ্রাম রাইজোবিয়াম কালচার ভাতের ফ্যান সহযোগে বা অন্য কোনো স্টিকার বা আঠার সহযোগে ১ একর জমির বীজের সঙ্গে মেশানো হয়। অনেক সময় গুড়ের জলের সাথে বীজ মাখিয়ে জীবানু সারের প্রয়োগ করা যায়।

নিড়ানী বা আগাছা দমন ঃ অনেক সময় দেখা যায় গাছ ঘন থাকলে তা পাতলা করে দিতে হবে। যদি আগাছা বেশি থাকে তাহলে নিড়ানী নিড়ানী দিতে হবে। পরের দিকে কোনো রকম ছত্রাক নাশক ব্যবহার না করাই ভাল। তবে চাষ করে বীজ বপন করলে বীজ বোনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পোন্ডামথালিন গোত্রের ওষুধ ২.০ মি লি প্রতি লি জলে স্প্রে করলে জমিতে আগাছা কম বের হবে। তবে এক্ষেত্রে আগাছানাশক ওষুধের মাত্রা ও সময় অবশ্যই সঠিক হওয়া দরকার।

রোগ ও পোকা ঃ

হলুদ মোজাইক ঃ ১৯৬০ সালে এই রোগটি প্রথম দেখা যায়। এই রোগটি ভাইরাস ঘটিত, কিন্তু এই ভাইরাসটি গাছের রস, বীজ বা মাটি দিয়ে সংক্রামিত হয় না। এই ভাইরাসটি সাদা মাছি নামক এক প্রকার পোকা দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই রোগটি মাসকলাই শস্যের ক্ষেত্রে ভয়ানক। পশ্চিমবঙ্গে এই রোগের প্রকোপে ১০-১০০ শতাংশ শস্যের ক্ষতি করে। বিভিন্ন আগাছা এই ভাইরাসের মজুত পোষক ও প্রাথমিক উৎস হিসাবে কাজ করে। বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগটি ছড়ায়।

প্রতিকার ঃ

(ক) আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে ফেলুন ও পুড়িয়ে বা মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
(খ) জমির চারপাশের আগাছা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
(গ) কীটনাশক হিসাবে থায়োমিথোক্সাম ৬ গ্রাম ১৫ লি জলে সঙ্গে সঙ্গে স্প্রে করুন। প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার স্প্রে করতে হবে।

পাতায় দাগ ঃ এই রোগ সাধারণভাবে ৪৭ শতাংশ পর্যন্ত শস্যের ক্ষতি করে। রোগটি ছত্রাক জনিত। বেশ কয়েকটি প্রজাতির ছত্রাকের কারণে এই রোগটি ছড়ায়। এক একটি প্রজাতি এক এক ধরনের দাগ তৈরি করে।
প্রতিকার ঃ বীজ বোনার ৩০-৪৫ দিন পর থেকে গাছের পাতায় ২-৩ বার কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে স্প্রে করে এই রোগটি ভালভাবে প্রতিকার করা যায়।

পাতা কোঁকড়ানো ঃ মাসকলাই ডালের এই পাতা কোঁকড়ানো রোগটি খুবই ভয়ানক। সাধারণত বীজ বোনার তিন-চার সপ্তাহ পরে প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যায় ও পরে এই লক্ষণ খুবই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। পাতাগুলি নীচের দিকে কুঁচকে যায়। ফুল আসার সময় দেখা যায় অনেকগুলি ছোট ছোট ফুলের কুঁড়ি। গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায় ও ফল ধরে না। ভাইরাসটি গাছের রসের মাধ্যমে সংক্রামিত গাছ থেকে সুস্থ্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। শিম গোত্রীয় অনেক গাছ এই ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই ভাইরাসটি সাধারণত একটি জাবপোকার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে ও ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকার ঃ

(ক) আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে ফেলুন ও পুড়িয়ে বা মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
(খ) জমির চারপাশের আগাছা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
(গ) কীটনাশক হিসাবে ডাইমিথোয়েট ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে স্প্রে করুন।